ভূমিকা

মধ্যযুগে 'ভাগবত'-এর গ্রহণীয়তা ছিল মূলত ভক্তিগ্রাহ্যপথে। ভক্তিদ্বারাই ভাগবত গ্রহণ করতে হবে, বুদ্ধি দিয়ে নয়— এই কথা পরিকরবৃন্দকে বুঝিয়ে ছিলেন স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব। কিন্তু ভক্তি ছাড়াও ভাগবতের আর একরকম ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। সেটি হল বুদ্ধি গ্রাহ্য পথ। যিনি ভক্ত তিনি যে ভক্তির চোখেই ভাগবতকে দেখবেন তা স্বাভাবিক। কিন্তু একজন গবেষকের দৃষ্টি অনুসন্ধানীর, জ্ঞানের। তাই মননশীল গবেষক ও ভক্তের মধ্যে বিরোধ প্রায়ই লক্ষণীয়। একজন ভক্তের চোখে যা সমিচীন, গবেষকের চোখে তা অশালীনও হতে পারে। আমরা গবেষকের অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়েই ভাগবতের আলোচনায় প্রবেশের প্রচেষ্টা পেয়েছি, কিন্তু সে প্রচেষ্টা ভক্তিকে কোন ভাবেই অগ্রাহ্য করে নয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শনে ভাগবত অদ্বিতীয় স্থান লাভ করেছিল। বলা ভালো যে, শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শন নয়, সমগ্র বাঙালি জাতির মনে-প্রাণে ভাগবত সুউচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত। ভাগবতের প্রতি এই অবিসংবাদিত শ্রদ্ধার কারণ একমাত্র চৈতন্যদেব। একটিমাত্র পুরাণ গ্রন্থ ভাগবতকে আশ্রয় করে একটি জাতির বিপুল ভাব-আন্দোলন এই বাংলাতেই ঘটতে দেখা যায়, এবং তা সম্ভব হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের দিব্যভাব প্রেরণায়। তাই অন্যভাবে বললে 'চৈতন্য-রেনেসাঁস' নামান্তরে ভাগবতীয় ভাব আন্দোলন। ভাগবত তত্ত্বরস প্রচারের জন্যই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হয়েছিল, এমনই একটি কথা সমগ্র বাংলায় এবং সাহিত্য জগতেও প্রচলিত রয়েছে। শ্রীচৈতন্য নিজে ভাগবতের পরমতত্ত্ব আস্বাদন করে তার নির্যাসটুকু রসরূপে জনগণে বিতরণ করেছেন। আবার গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্ব গড়ে উঠেছে তাঁরই প্রেরণায় ভাগবতকে আশ্রয় করে।

মধ্যযুগে যে তুর্কী আক্রমণ হয়েছিল, সেই আক্রমণে সমাজ, সাহিত্য এবং জনজাতির অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। যখন একটু একটু করে মানুষ সুস্থির একটি পরিবেশ পেতে শুরু করল তখন থেকেই আবার সাহিত্যের অল্প বিস্তর চর্চা শুরু হল। আর এই সাহিত্য চর্চা মূলত হয়েছিল মুসলমান শাসনকালেই। আমরা মধ্যযুগে যে বাংলা সাহিত্য পেয়েছি, সেই বাংলা সাহিত্যও প্রধানত মুসলমান শাসনাধীনেই লিখিত, বিরচিত, অনুবাদিত। আবার এই মুসলমান রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেরও পরিসমাপ্তি ঘটে। এই ভিন্ন দেশী, ভিন্ন ধর্মী এবং ভিন্ন ভাষী মুসলমান শাসনকালেই আমাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃত পুরাণ-সাহিত্যের চর্চা শুরু হয়েছিল। এই সব পুরাণ সাহিত্যের মধ্যে ভক্তিরস যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় গল্প

রসও। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কবিরা এই গল্প রসকেই গ্রহণ করলেন অতি মাত্রায় প্রাধান্য দিয়ে। কিন্তু কবিদের দ্বারা গল্প রস গ্রহণ করা হলেও ভক্তিরস একেবারেই বর্জিত হয়নি। তাইতো আমরা মধ্যযুগে সাহিত্য সাধনার কতগুলি ধারা পেয়ে যাই। যেখানে আছে মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্যের মত প্রধান ধারা।

মঙ্গলকাব্যগুলি গড়ে উঠেছে প্রধানত বিভিন্ন দেবদেবীর 'বিজয়' কাহিনিকে কেন্দ্র করে মানুষের মঙ্গল কামনায়। বৈষ্ণব সাহিত্য গড়ে উঠেছে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে কেন্দ্র করে। আর তৃতীয় ধারায় আমরা পাই বিভিন্ন পুরাণের অনুবাদ। যেখানে প্রাধান্য পায় রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের মত পুরাণ গ্রন্থ। যেগুলি অনুবাদিত হয়েছিল লোক নিস্তারের জন্যই। এছাড়াও মধ্যযুগের সাহিত্য ধারায় আমরা নতুন দুটি ধারা লক্ষ্য করি। যথা— জীবনী কাব্যের ধারা ও রোমান্টিক প্রণয়কাব্য ধারা। চৈতন্য ভক্তদের দ্বারা চৈতন্যের দিব্য জীবনলীলাকে কেন্দ্র করেই জীবনী কাব্য ধারার সূত্রপাত। আর রোমান্টিক প্রণয়কাব্য ধারার সূত্রপাত বলা যায় মুসলমান কবিদের হাতে। তাই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বৈচিত্রহীন একথা বলা ধৃষ্ঠতার নামান্তর। কিন্তু একটি কথা স্বীকার করতে হবে, তা হল— মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বেশিরভাগ অংশ কৃষ্ণকথাময়। শুধুমাত্র একক কৃষ্ণ নয়; বলা ভালো রাধা-কৃষ্ণময়।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর যে অনুবাদগুলি আমরা পেয়েছি সেই অনুবাদে কৃষ্ণই মুখ্য। কৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলার পাশাপাশি তাঁর মাধুর্যলীলা সেখানে প্রকাশিত। এই কৃষ্ণ কাহিনিগুলিতে কৃষ্ণের মথুরালীলা, দ্বারকালীলা, ও বৃন্দাবনলীলা বেশি মাত্রায় প্রাধান্য পেয়েছে। আর রাধা মুখ্য মূলত বৈষ্ণব পদাবলীতে। জয়দেব থেকে শুরু করে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দ দাসের কাল পেরিয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রত্যেকেই এই ভক্তিরসে, রাধা-কৃষ্ণ প্রেমভাবনায় বিগলিত। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীতেও রাধা-কৃষ্ণ প্রেমভাবনায় এতটুকু ভাঁটা পড়েনি। বলাবাহুল্য, একটি বিষয় নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে আর কোনো দেশে এভাবে সাহিত্য চর্চা হয়নি।

বাংলা ভাষায় 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর প্রথম সাল-তারিখযুক্ত অনুবাদ হিসেবে আমরা পাই মালাধর বসু রচিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থটি। বাংলায় চৈতন্যের আগমনের পূর্বে কৃষ্ণকথার প্রথম জোয়ার শুরু এখান থেকেই। তার আগে বাংলায় কৃষ্ণকথা প্রাধান্য পায় নি এমন নয়। তাহলে প্রশ্ন হল, বাংলায় কৃষ্ণকথা কোন সময় থেকে প্রাধান্য পেয়েছিল ?

সুকুমার সেনের মতে বাংলায় কৃষ্ণকথা পাওয়া যায় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে আসাম-বাংলার বর্ম রাজাদের সময় থেকেই। এই প্রসঙ্গে 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ডে তিনি জানিয়েছেন—

"রাজ-শাসনে বিষ্ণু-কৃষ্ণের বন্দনা আসাম-বাঙ্গালার বর্ম-রাজাদের সময় হইতে মিলিতেছে। কামরূপের বনমালবর্মের শাসনে (নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ) কৃষ্ণলীলার উল্লেখ আছে। সমতটের ভোজবর্মের শাসনেও ব্রজলীলার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে—

সোহপীহ গোপীশতকেলিকারঃ

কৃষ্ণো মহাভারত সূত্রধারঃ।

অর্ঘঃ পুমানংশকৃতাবতারঃ

প্রাদুর্বভুবোদ্ধৃত ভূমিকারঃ।।"[১]

অর্থাৎ— সেই গোপীশতকেলিকার কৃষ্ণ মহাভারতের সূত্রধার যিনি এখানে ভূমি ভার উদ্ধারকারী অংশাবতার রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। জানা যায় যে, একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে হরিবর্মের মহামন্ত্রী ভট্ট ভবদেব ভূবনেশ্বরে মন্দির, দীঘি এবং উদ্যান নির্মাণ করে অনন্ত বাসুদেব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন। আবার সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়সেন বরেন্দ্রভূমিতে দেব মন্দির, সরোবর ও উদ্যান নির্মাণ করিয়ে প্রদ্যুম্নেশ্বর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, নবম শতকেও কৃষ্ণ কথা প্রাধান্য পেয়েছিল। কিন্তু ভাগবত পুরাণ জানা ছিল কিনা তার কোনো প্রমাণ নেই। সুকুমার সেনের মতে—

> "গৌড়ে হিন্দু রাজকর্মচারী-মন্ত্রীরা অনেকেই বিষ্ণু-উপাসক ছিলেন। তাঁহাদের কাছে নূতন করিয়া বৈষ্ণবতার ঢেউ আসিল তীরহুত হইতে। তীরহুতের কবি উমাপতি-বিদ্যাপতির কৃষ্ণলীলা-পদাবলী এবং সেই পদাবলী গানের পদ্ধতি বাঙ্গালা দেশের লুপ্ত সাহিত্যবৃত্তিকে নূতন চেতনায় জাগাইয়া দিল। শুধু সাহিত্যে নয়, অধ্যাত্মভাবনায়ও নূতন সূত্রের নির্দেশ দিল তীরহুত হইতে ভাগবত-পুরাণ আসিয়া। পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে বাঙ্গালা দেশে ভাগবত পুরাণ জানা ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ নাই।"[২]

এখানে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক তাহলে ভাগবত পুরাণ প্রাধান্য পেল কোন সময় থেকে ? উত্তরে বলতে হয়, চৈতন্য যে ভক্তিরস বন্যা এনেছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতে তার

ভূমিকা রচিত হয়েছিল পঞ্চদশ শতাব্দীতে গৌড় দরবারের রাজকর্মচারীদের দ্বারা ভাগবতের অনুশীলনে। আর সেই সময়েই বাংলায় তার বিস্তার ঘটিয়েছিলেন মাধবেন্দ্রপুরী। মাধবেন্দ্রপুরীর নিবাস কোথায় তা জানা যায় না। কিন্তু তিনি গোপালের পূজার জন্য চন্দন কাঠ নিতে প্রতি দুই তিন বছরে একবার দ্রাবিড় দেশে যেতেন। তিনি যে পথে যাতায়াত করতেন সে পথেই পরে কুলীন গ্রাম। সুকুমার সেনের মতে মালাধরের সঙ্গে হয়তো তার সাক্ষাৎলাভ হয়েছিল। মালাধর হয়তো তার সাক্ষাৎ লাভ করার পরেই ভাগবত অনুবাদে অগ্রসর হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে ড. সুকুমার সেনের মন্তব্য—

> "পঞ্চদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণভক্তির নূতন স্রোত বহিয়া আসিল ভাগবত-পুরাণের উৎস হইতে। এই স্রোতের মুখ যিনি প্রত্যক্ষত খুলিয়া দিয়াছিলেন তিনিই চৈতন্যের আগমনের পথও নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইনি মাধবেন্দ্রপুরী, অদ্বৈত মতে দীক্ষিত সন্ন্যাসী কিন্তু কৃষ্ণরসে ভরপুর। কোথায় ইহার দেশ জানা যায় নাই। ... তাঁহার গতায়াতের সূত্রে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে পূর্বভারতের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার কাছে ভক্তিদীক্ষা পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন অদ্বৈত আচার্য, চৈতন্যের মাতার ও ভ্রাতার গুরু...। আর একজন, মনে হয়, কুলীনগ্রামের গুণরাজ-খান। ... সম্ভবত মাধবেন্দ্রের দ্বারাই ভাগবত মিথিলা হইতে বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইয়াছিল।"[৩]

কিন্তু চৈতন্যভাগবতে প্রদত্ত তথ্য এই সিদ্ধান্তের বিপরীতেই রায় দান করে। সেখানে দেখা যায় প্রথম সাক্ষাতেই অদ্বৈত আচার্য মাধবেন্দ্রপুরীকে 'ভাগবতীয়া বৈষ্ণব' বলে চিনতে পেরেছিলেন। এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, মাধবেন্দ্রের পূর্ব থেকেই ভাগবতের সঙ্গে অদ্বৈতের পরিচয় ছিল। এমনকি এই শাস্ত্রে তাঁর অগাধ জ্ঞান না থাকলে প্রথম দেখাতেই মাধবেন্দ্রের বৈষ্ণব লক্ষণ চিনে নেওয়া তাঁর পক্ষে আদেও কতটা সম্ভব ছিল বলা যায় না। চৈতন্যভাগবতে দেখি বিষ্ণুভক্তি শূন্য সংসারে অদ্বৈত আচার্য যখন বিষ্ণুভক্তি ব্যাখ্যা করতেন, গীতা-ভাগবত পড়াতেন তখনই মাধবেন্দ্রের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাহলে একথা স্বীকার করতেই হয় যে, মাধবেন্দ্রপুরীর প্রচারের পূর্ব থেকেই গীতা-ভাগবত বাংলায় পরিচিত ছিল। বৈষ্ণব জীবনী গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে, অদ্বৈত শ্রীচৈতন্যের পিতার বন্ধু ছিলেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই একথা বলা যায় যে, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের বহুকাল পূর্বেই তাঁর জন্ম। চৈতন্য পরিকররূপে যারা পরবর্তীকালে বিখ্যাত হয়েছিলেন সেই ভক্ত সম্প্রদায় চৈতন্যের জন্মের বহু পূর্বে ভাগবতীয় ভক্তিধারার পথ প্রস্তুত করে

রেখেছিলেন। মাধবেন্দ্রপুরীর ভাগবত প্রচারের আগেই যে ভাগবত চর্চা বাংলায় হয়েছিল তার প্রমাণ চৈতন্যভাগবতেই আছে—

"গীতা-ভাগবত যে যে জনে বা পঢ়ায়।

ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়।।"[৪]

তাহলে আমরা একথা বলতেই পারি, মাধবেন্দ্রপুরী হঠাৎ করে ভাগবত প্রচার করেন নি, আর মালাধরও হঠাৎ করেই তার অনুবাদে অগ্রসর হন নি।

ভাগবত গ্রন্থ পূর্বাপর পাঠ করে যে বিষয়টি অনুধাবন করা গিয়েছে তা হল— এই গ্রন্থ শুধুমাত্র ভক্তি শাস্ত্র নয়, শুধু ধর্ম গ্রন্থও নয়, এটি অপূর্ব একটি কাব্যও একই সাথে। এর প্রেমভাবনা, এর সৌন্দর্য কল্পনা যুগে যুগে বাঙালি কবিদের চিত্তকে করেছে আলোড়িত। তাইতো কবি মালাধর থেকে শুরু করে মাধবাচার্য, ষোড়শ শতকের রঘুনাথ ভাগবতাচার্য থেকে সপ্তদশ এর ভবানন্দ এবং অষ্টাদশ-এ বলরাম দাস থেকে অভিরাম দাস পর্যন্ত প্রত্যেকেই তাঁদের কাব্যের পসার সাজিয়েছেন ভাগবতের অমোঘটানে।

পঞ্চদশ শতকে লেখা মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ও ষোড়শ শতকে লেখা রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'— দুটিই সুপ্রাচীন কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য। এই দুটি কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা আমাদের গবেষণা সন্দর্ভের বিষয়। তুলনামূলক আলোচনায় বিষয়ের দিকে যেমন আমরা নজর দিয়েছি, তেমনি কবিদ্বয়ের কাহিনি বয়নের নিপুণতা ও চরিত্র চিত্রণের দক্ষতার দিকটিও দেখানো হয়েছে সমান ভাবে। মূল সংস্কৃত ভাগবত কাহিনিকে কোন কবি কতটা গ্রহণ করেছেন, কতটা বর্জন করেছেন এবং অনুবাদ হয়েও কতটা মৌলিক হয়ে উঠেছে তা সংস্কৃত ভাগবত-এর কাহিনির সঙ্গে পৃথক ভাবে যেমন আলোচনা করা হয়েছে, তেমনি এই দুই কবির অনুবাদিত গ্রন্থের মধ্যেকার পার্থক্যও বিস্তারিত ভাবে এই গবেষণা সন্দর্ভে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি।

তথ্যসূত্র :

১. সেন, সুকুমার : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'(১ম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ- ১৯৪০, দ্বাদশ মুদ্রণ, মে- ২০১৫, পৃষ্ঠা - ২২।

২. ঐ, পৃষ্ঠা - ৯৩।

৩. ঐ, পৃষ্ঠা - ১১।

৪. নাথ, রাধাগোবিন্দ (সম্পাদিত) : 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', আদি খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, সাধনা প্রকাশনী, ৭৫/২ বি, রায় বাহাদুর রোড, কলকাতা-৩৪, প্রথম প্রকাশ-আষাঢ়, ১৩৭৩, শকাব্দা ১৮৮৮, জুন-১৯৬৬, নবকলেবর রথযাত্রা, আষাঢ় ১৪১৯, জুন, ২০১২, পৃষ্ঠা – ৭৪।